এ পরবাস

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥এ পরবাস॥

আকাশের গতিক সুবিধের ছিল না, সেটা খেয়েদেয়ে হোটেলে ফিরবার পথেই টের পেয়েছিল বিনত। কিন্তু তাও বেড়াতে যাবার আনন্দ ওদের প্রস্তুতিতে কোনও বাধা দেয়নি। পাঁচমেশালি গলার চেঁচামেচিতে ওর ছোট্ট ভাতঘুমের আয়েস ছিঁড়ে যাচ্ছিল বারবারই। কাজেই বাইরে আলো কমে আসা, মেঘের তর্জন-গর্জন সবই টের পাচ্ছিল।

আড়চোখে দেখতে পেয়েছে দীপা চুলে চিরুনি ছুঁইয়েছে, এই সময়ই চড়বড় করে নেমে গেল বেহায়া বৃষ্টি।

চোখ একটু বেশি খুলেছিল বোধহয়, ঠোঁটের কোণে হালকা হাসির সঙ্গতও থাকতে পারে সেই সঙ্গে, দীপা দেখে ফেলেছিল। পরিচিত ঝটকায় ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, 'তোমার জন্যেই সব পণ্ড হয়ে গেল! আগেই জানতাম আমি–'

'দাঁড়াও দাঁড়াও'–চোখ পুরো খুলে ঘরটা ফাঁকা কিনা দেখে নিয়ে বিনত বললে, 'অসময়ের মেঘ চিরে বৃষ্টি নিয়ে আসব, অত ক্ষমতা কি আমার এখনও–'

'ন্যাকামি কোর না।' বিনতর কৌতুককে একেবারে পাত্তা না দিয়ে দীপা বললে, 'বেড়াতে এসেছ, কোথায় নিজে আমাদের ঠেলেঠুলে বার করবে, তা না, সকাল থেকে কী যে এক ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করেছ–'

BANGLADARSHAN.COM

'ঘ্যানঘ্যানানি মানে?'

'ওই যে, কী নাকি ভুলে গেছ–কিছুতেই মনে পড়ছে না–'

'তা মনে না পড়লে কী করব বলো। সকাল থেকেই এত মনে করার চেষ্টা করছি কথাটা–খালি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ভীষণ জরুরি, অথচ একবারও–'

'থামো থামো'–ফাটা রেকর্ড শুরু হয়ে গেল ফের! দীপা চুলগুলো ঝুরো ঝুরো করে চারদিকে ছড়াতে ছড়াতে বলল, 'অতই যদি রাজকার্য ছিল তো সেটা সেরে এলেই তো পারতে! দু'দিন পরে বেড়াতে এলে আর–'

'না না, সেইটাই তো অবাক লাগছে!' বিনত বললে–'বেড়াতে আসব বলে সমস্ত ঝঞ্ঝাটই তো মিটিয়ে এসেছি অফিসের। এর বাইরে কী এমন ব্যাপার থাকতে পারে যে–'

'ভাব! আরাম করে ভাব শুয়ে শুয়ে। বৃষ্টি তো আর এখন ছাড়ছে না চট করে–' দুম দুম পায়ের আওয়াজ তুলে দীপা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দীপার ভঙ্গি দেখে হাসি পেল বিনতর। চল্লিশের ওপর বয়স হয়ে গেল ওর, মেয়ে পড়ছে কলেজে—কে বলবে। যখন-তখন বাচ্চা মেয়ের মতো গাল ফুলিয়ে ঝগড়া, কথায় এঁটে উঠতে না পারলেই চোখে জল এসে যায়—আবার দু'-এক পশলা বর্ষণের পরই যে কে সেই, আগের মতো নির্মল নীল আকাশ।

না, দীপাকে অন্তত এখন কোনো দোষ দিতে পারে না বিনত। বেড়াতে বেরিয়ে এরকম একটা বাজে ব্যাপার ঘটে গেলে কারই বা ভালো লাগে! বিশেষ করে সেটা যদি আবার এরকম মহার্ঘ বেড়ানো হয়ে ওঠে। মাত্রই সাত-আটটা দিনের জন্যে সামান্য এই ছোট্ট একটু বেরোন—মধুপুরে কদিন আর, বাকিটা দেওঘর, সেটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করতে হয়েছে নয় নয় করে প্রায় তিন বছরের ওপর। এমনিতে অবশ্য যাওয়াই হত প্রত্যেকবার, তপার মাধ্যমিকের বছরে দীপা নিজেই হঠাৎ ব্যাগড়া দিল জোরজার করে—না, এবারটা কোথাও যাওয়া উচিত হবে না। সেই শুরু, তার পরই বিনতর অসুখ, চলাফেরা-খাওয়া দাওয়ার সাবধানতা, তারপর তপার হায়ার সেকেন্ডারি। 'খুব ভালো করে না পড়লে কোথাও পাত্তা পাবি না'—দীপার কথা। সুতরাং কলেজে ভর্তি না হয়ে আর বেরোবার উপায় কই। এত কাণ্ড করে বেরোনোর পর যদি অসময়ের বৃষ্টিটা হঠাৎ দেওঘরে এসে এমন বেআক্কেলে কাণ্ডকারখানা শুরু করে দেয়—কারই বা মেজাজ ঠিক থাকে! কিন্তু করারই বা কী আছে, বেছে বেছে পুজোর ঠিক দু'দিন পরে বেড়াবার প্ল্যান বানানো হল—শুকনো খটখটে পুজো এবার, সাতদিনের মধ্যে আকাশের মেজাজ এমন পালটে যাবে, এ আর ভাবতে পেরেছে কে!

BANGLADARSHAN.COM

এখন আর কোনও চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকলে হাত পুরনো অভ্যেসমতো টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় না, কিংবা প্যান্টের পকেটে। মৌরি চিবিয়েছিল খাওয়ার পর, তারই দুটো-একটা এখনও ঢুকে আছে দাঁতের ফাঁকে। জিভ দিয়ে সেগুলো টেনে বার করার চেষ্টা করতে করতে বিনতর মনে হচ্ছিল, কাল বিকেল পর্যন্ত ভ্রমণটা বেশ উপভোগ করেছে ও; না শুধু ও কেন, সকলেই। আসলে শেষ পর্যন্ত তো একটা বিরাট টিম হয়ে গেল কিনা! তাও তো বোসদা তখন ছিলেন না, এখন যা দাঁড়িয়েছে দলটার চেহারা, তার পরও যদি দেওঘর ভ্রমণটা না জমে—

ঘরে কেউ ঢুকছে মনে করে চোখ খুলেছিল বিনত। খুলে দেখল কেউ ঢোকেনি। বৃষ্টি সমান তালে হয়ে চলেছে। অন্যান্য ঘরে কলরব চলছে। এছাড়া তো আর কিছু করার নেই এখন!

এইভাবে দল বেঁধে বেড়াবার প্ল্যানটা দিয়েছিল আসলে সুধন্য। ছেলেটা খুব বেশি দিন ঢোকেনি ওদের অ্যাড-কোম্পানিতে, কিন্তু দারুণ প্রোমাইজিং। যেমন বোল্ড হাতের রেখা, তেমনি সাজেস্টিভ। বিনতর মতোই ফাইন আর্টের ভক্ত, কিন্তু তুলি ধরতে হয়েছে কমার্শিয়াল আর্টের জন্য। উপায় নেই, কত তরুণ শিল্পী এইভাবে জীবিকার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তার ঠিক আছে! বিনত তবু ফাইন আর্টের চর্চাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে—একটা নামী কাগজ চিত্র-সমালোচক হিসেবে ওকে খাতির করে, ফাইন আর্টের প্রদর্শনী হলে আমন্ত্রণ জানায়, কিন্তু সকলের ভাগ্যে তো আর এ সুযোগ ঘটে না।

অবশ্য সেজন্য কোনো দুঃখ নেই সুধন্যর। দিব্যি ফুর্তিবাজ ছেলে, সব সময়েই হই-হুল্লোড় করছে। অথচ কাজেও ফাঁকি নেই কোনও–ধরতে গেলে হাতের কাজ টেনে নিয়ে করে দেয়, শেষ বেলায় কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেও মুখভার নেই। মহালয়ার দিন সুধন্যই বলেছিল, 'কী দাদা, পুজোর পর একটু বেরোবেন নাকি?'

'যাচ্ছ তোমরা?' অন্যমনস্ক ভাবেই কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল বিনত।

'হ্যাঁ, মানে মধুপুরে একটা বিশাল বাড়ি পাওয়া গেছে–পাথরচাপটিতে, মাতৃকা বলে একটা বাড়ি। তো একটু দলবল নিয়ে না গেলে তো সেখানে–'

তা সে দলটাকে বড় করবার জন্যেই বিনত ডেকে নিয়েছিল রাধুকাকাকে। সম্পর্কটা যত দূরেরই হোক, ওদের সংসারে ঘন ঘন যাতায়াত আছে রাধুকাকার, সেই সঙ্গে অভিভাবকত্বও দেখাতে চেষ্টা করেন যথেষ্ট। সংসারে থেকেও সংসারের ঝামেলাকে চমৎকার পাশ কাটাতে পারেন, এরকম এক ধরনের মানুষ আছেন না–রাধুকাকা ঠিক সেই জাতের মানুষ। গল্পবাজ, আড্ডাবাজ–আর ওই এক নেশা, বেড়ানো। বেড়াবার নাম শুনলেই পাগল, সে যেখানেই হোক না কেন। শেষ মুহূর্তে তপা পেয়ে গেল ওর নীপা মাসিকে, প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটা ডান্স ট্রুপের শিল্পী, বিয়েথা করেনি–ওই নিয়েই আছে। রবীন্দ্রসদনে এসেছিল একটা প্রোগ্রাম করতে, দিন দশেক ফ্রি আছে শুনেই বুক করে ফেলেছিল তপা।

BANGLADARSHAN.COM

ওদিকে সুধন্য নিয়ে নিল ওর শালাবাবু মননকে। সায়েন্স কলেজে এম. এস-সি পড়ে, চারচৌকস ছেলে বলতে যা বোঝায়, এক্কেবারে তাই। সুধন্যর স্ত্রী তিস্তাকেও আগে দেখেছে বিনত–প্রধানত নিজের ওই অসুখের সময়টাতেই, সেও কিছু কম চালাক-চতুর নয়, কিন্তু ভাইয়ের কাছে লাগে না। সন্ধের পর তো আর কিছুই করার থাকত না মধুপুরে! রান্নারও হাঙ্গামা নেই–তরকারি করাই থাকত সকালে, বিকেলে বেড়াবার পথে কিছু রুটি কিনে নিয়ে ফেরা। রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত বসত মজলিশ–নাচগানের তো কথাই নেই, সেইসঙ্গে ছিল অন্তাক্ষরী, কমিক, প্যারডি, এমনকি রাধুকাকার দরাজ গলায় পুরনো দিনের নাটক পর্যন্ত! কোথা দিয়ে সে উড়ে বেরিয়ে যেতো সময়টা–

'এই যে মিস্টার সেনগুপ্ত'–চোখ বন্ধই ছিল, বোসদার গলা কানে যেতেই তাড়াতাড়ি চোখ খুলে উঠে বসল বিনত, 'আসুন, আসুন।'

'আসুন মানে!' মোটাসোটা শরীর নিয়ে থপ থপ করে এগিয়ে এলেন বোসদা, 'ওরা সব বেরোন হল না বলে হা-হুতাশ করছে, আর আপনি দিব্যি এখানে ঘুম মারছেন?'

'আপনিও তো মেরে এসেছেন দাদা, ছলনা করছেন কেন?' বিনত বলল–'চোখের কোল দুটো তো আর এমনি এমনি ফুলে যায় না! নাকি বউদি বকাবকি করেছেন?'

‘অ্যাঁ! বকাবকি করেছে! বউদি?’ বলতে বলতেই বসে পড়েছেন খাটে। হাসির দমকে খাট কাঁপতে শুরু করেছে, এবং তারপরই যা হয়—পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে সুদৃশ্য নস্যির কৌটো।

বোসদা এই দেওঘরের নতুন সংযোজন। কাল দুপুরে দেওঘরে এসে পৌঁছবার পর বিনতরা বিকেলে গিয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের আরতি দেখতে। ভেতরে বসে খেয়াল করেনি, আরতি যখন শেষ হয়েছিল, আকাশ তখন ভেঙে পড়ছে। খানিক এগিয়ে কোন রকমে দুটো অটো পেয়ে গিয়েছিল। ঠিক হোটেলে ফিরেছে আর মুষলধারে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। রাত যত বাড়ে বৃষ্টিও তত বাড়ে। এদিকে দুপুরের পর থেকে পেটে দানাপানি পড়েনি বিশেষ কারও। তপা ঘুরঘুর করছে, বলছে না কিছু। সুধন্যর মেয়ে কুট্টুস খিদের চোটে ঘুমিয়ে পড়ে এমন অবস্থা। সুধন্য আর বিনত একবার হোটেলের পোর্টিকো পর্যন্ত গিয়ে দেখে এসেছে, রাস্তা একেবারে সুনসান—ট্যাক্সি, অটো দূরে থাক, একটা রিকশার পর্যন্ত পাত্তা নেই কোথাও। হোটেলের ম্যানেজারের কাছে ইতিমধ্যেই একবার ছাতা চাওয়া হয়ে গিয়েছে এবং তাতে দেঁতো হাসি ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। রাধুকাকা বুড়ো মানুষ, তাঁকে কষ্ট দেওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত ভিজেই যেতে হবে খাবারের সন্ধানে, এই ভেবে যখন প্যান্টের পায়া গুটিয়েছে বিনত, ছাতা হাতে দোতলা থেমে নেমে এসেছিলেন এই মানুষটি, বোসদা।

‘ধন্যবাদ!’ কী যে হয়েছিল বিনতর কে জানে, সম্পূর্ণ অচেনা এই ভদ্রলোকের হাত থেকে ছাতাটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বলেছিল—‘দারুণ উপকার করলেন।’

BANGLADARSHAN.COM

‘মানে!’ বিস্ময়ের প্রথম দমকটা সামলাবার চেষ্টা করে ভদ্রলোক বলেছিলেন, ‘ছাতা নিয়ে তো আমি খাবারের সন্ধানে যাচ্ছি।’

‘আমিও তো তাই’—ভদ্রলোকের দর্শনীয় মুখের দিকে তাকিয়ে বিনত বলেছিল, ‘কজন লোক আপনারা?’

‘আমরা? মানে আমি আর আমার—ইয়ে আর কী!’

‘তাহলেই বুঝুন’—মুখ থেকে প্রায় কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিল বিনত, ‘আপনি-কপনির ব্যাপার তো নয়; কুল্লে আট-নজন প্রাণী। কাজেই আপনাকে তো একটু স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে দাদা!’

‘আর আমরা? হরিমটর?’

‘ছি ছি ছি, তাই কি হয়!’ বিনত ছাতা নিয়ে এগোতে এগোতে বলেছে—‘নীচের ডরমেটরিতে চলে আসুন। ওটা আর পাশের ডাবল রুমটা আমাদের। খুদকুঁড়ো যা পাই ওই ডরমেটরিতে বসেই আজ সকলে মিলে—’

মানুষটাকে যত ভোঁতা মনে হয়েছিল তা যে তিনি আদৌ নন, সেটা ফিরে আসার পরই টের পেয়েছিল বিনত। পোর্টিকোতে সকলকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বোসদা। বউদি ছিলেন একেবারে সামনে, বিনতর রিকশ ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উলু দিয়ে উঠেছিলেন। বোসদা অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে এসে বলেছিলেন, ‘মিস্টার সেনগুপ্তর জন্যে বড়ই চিন্তিত ছিলাম এতক্ষণ’—তারপর গলা নামিয়ে, ‘আমার ছাতার জন্যেও।’ ফের গলা

তুলে–'কারণ নবকুমাররা কাষ্ঠারোহণে গিয়ে বড় একটা ফেরেন না। কিন্তু আমাদের ছত্রপতি বীর সফল হয়ে ফিরে এসেছেন। এ যে কী আনন্দের কথা–'

ডিনার-পর্ব চলেছিল কাল ঘণ্টাতিনেক ধরে। যে দু-তিন দিন থাকা হবে দেওঘরে, এই নিঃসন্তান দম্পতিটি যে সঙ্গী হয়ে গেলেন তাদের, বিনত স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল।

বিনতর বোধহয় ইচ্ছে হচ্ছিল এক টিপ নস্যি নেবার, ইচ্ছেটা বুঝতে পারলেন না বোসদা। নস্যির ডিবে পকেটে ফেলে বললেন, 'ইমেজটা খুব খারাপ করে ফেললেন কিন্তু।'

'আমি!' ভুরু কুঁচকে বিনত বললে, 'কী আশ্চর্য, বৃষ্টি যদি পেছনে লাগে–'

'আরে না না, বৃষ্টি তো এলো এখন। মামলা আপনি সকালেই ঢিলে করে দিয়েছেন।'

'সে কি! কখন?'

'ওই যে, সকালে যখন পুরনো টাউন দেখতে গেলাম আমরা! আপনি তো গেলেন না'–দু'আঙুলে বেশ খানিকক্ষণ টিপে ধরা নস্যিটুকু নাকের গহ্বরে চালান করে দিয়ে বললেন, 'মনটন খারাপ না কী শুনলাম যেন–'

'না না, মন খারাপ নয়'–বিনত বাধা দিয়ে বলল, 'সকাল থেকেই কেমন যেন মনে হচ্ছিল–ইন ফ্যাক্ট, এখনও যে হচ্ছে না তা নয়, মানে কী যেন একটা কাজ সারবার ছিল, অথচ–'

BANGLADARSHAN.COM

'ফুস্!' এক ফুঁয়ে কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে বোসদা বললেন, 'এ সব আপনি এখনও ভাবেন নাকি? অফিসকে ফেলে এসেছেন কলকাতায়, চিন্তাটাকেও সেইখানে ফেলে রাখুন। কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে–'

একটা উৎকট সুর, অন্তত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে যার কোন মিল নেই, বোসদার কথার শেষাংশে জুড়ে দিয়েছিল। আর সেই শুনেই বোধহয় কুট্টুস দৌড়ে ঢুকেছে ঘরে, তারপর বিনতর চাদরের মধ্যে ঢুকে পড়ে বলেছে, 'সেই ভালো জেঠু, গানের লড়াই হোক মধুপুরের মতো।'

'বলছিস?' বিনত কুট্টুসের গাল টিপে দিয়ে বোসদার দিকে চাইল–'নিন বোসদা, শুরু হয়ে যাক তাহলে।'

'সেই ভালো সেই ভালো'–গানের সুরটা হালকাভাবে ঠোঁটে রেখে তিস্তা এসে দাঁড়াল দরজার সামনে, ওদিকে তাকিয়ে উচ্ছলভাবে হাত নাড়তে নাড়তে বললে, 'এই বউদি–রাধুকাকা–মনু–এই, কোথায় তুমি! এসো না এদিকে চটপট, গানের লড়াই শুরু হচ্ছে।'

'অ্যাঁ! সত্যি!' আহ্বানে সাড়া দিয়ে তপাই প্রথমে ছুটে এল–'বোস জেঠু, তুমি গান গাইবে?'

'রক্ষে করো মামণি'–মুখ কাঁচুমাচু করে বোসদা বললেন, 'গানের লড়াই তোমার জেঠিমার সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে হয় বটে, তবে সে গানের বানান অন্য–জি-ইউ-এন।'

‘ওসব বললে শুনবো না’–প্রথমেই এবার মাথা দেখা গেল দীপার, পাশেই ছিল মনন, একটু পেছনে রাধুকাকা। দীপা বলল, ‘তপোবন পাহাড় যখন যাওয়াই হচ্ছে না, অন্য কিছু তো চাই একটা। যা তপা, তোর জেঠিমাকে ডেকে নিয়ে আয়।’

‘সাধু প্রস্তাব।’ দু’হাত তুলে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন রাধুকাকা, ‘আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।’

‘আমিও!’ বোসদা হাত তুলে বললেন–‘কেবল আমাকে দর্শকের আসনে বসার অনুমতি দেওয়া হোক।’

‘পাগল নাকি!’ সুধন্য জামা গলাতে গলাতে ঢুকল ঘরে, ‘আর্টিস্টের খুব ডিমান্ড এখন–নিন দাদা, স্টার্ট করুন।’

‘আমিই! চমৎকার!’ বোসদা রুমাল বার করে নাকটা মুছে নিয়ে বললেন–‘আমি স্টার্ট করলে কিন্তু খেলাটা এগুবে না। গানের গুঁতোয় বাকি আর্টিস্ট সব ধরাশায়ী হয়ে পড়বে।’

‘এক্কেবারে ঠিক কথাটি বলেছ’–বউদি হাসতে হাসতে ঢুকলেন, ‘ওই গুঁতো সামলানো যে কি কঠিন আজ পঁচিশটা বছর ধরে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি আমি। সুতরাং আমি বলি কি–’

‘না না, চলবে না–চলবে না–’ তপা, কুট্টুস এবং তিস্তার সম্মিলিত প্রতিরোধে বোস বউদির যখন প্রায় বিপর্যস্ত অবস্থা, দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল নীপা, গলা যতটা সম্ভব তুলে বললে, ‘সাইলেন্স, সাইলেন্স প্লিজ–’

BANGLADARSHAN.COM

সেকেন্ড পাঁচেক সময় লাগল কলরবটা থিতিয়ে যেতে। একটা মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে নীপা বললে, ‘দেয়ারস্ অ্যান ইম্পরট্যান্ট অ্যানাউন্সমেন্ট ফর ইউ। দারুণ একটা মেসেজ দেব সকলকে।’

একটু থেমে হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে হাওয়ায় ঢেউ তুলে ভাসার এক অপূর্ব লীলায়িত ভঙ্গিতে নীপা বললে, ‘রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে! বৃষ্টি ছেড়ে গেছে। সুতরাং আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা রওনা হতে পারি দিদি–ইজন্ট্ ইট!’

মিনিট কুড়ির মধ্যেই দৃশ্যপটের সম্পূর্ণ পরিবর্তন। গার্ডেন-রাজকোট-বালুচরি সব বেরিয়ে পড়েছে স্টক থেকে। পারফিউমের ঘোরে বাতাস থমকে আছে। হালকা হাসির সঙ্গে ক্রিস্ট্যাল ঝিলিক মারছে। ছেলেরা সে তুলনায় অবশ্য সাধারণ। ওদের মধ্যে মননই যা-একটু জেল্লা মেরেছে জিন্‌সে আর পাওয়ার শু-তে। সুধন্যর বাটিক শার্ট আর কাউন্টি ক্যাপও অবশ্য কম যায় না। বাকি সব ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখছে গেটের বাইরে।

দুটো বড় অটোই করতে হল, নয় নয় করে লোকও তো নেহাৎ কম না। প্রথম অটোয় হই হই করে উঠে পড়ল তপা আর মনন, একেবারে সামনে। দীপার ভুরু কুঁচকে যাচ্ছিল, বুঝতে পেরেছিল বিনত। তাই একটু সামলাবার জন্যে তাড়াতাড়ি কুট্টুসকে অটোয় চড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘দিদি ফার্স্ট হয়ে গেল কিন্তু।’

অন্যদিকে পাশাপাশি বসেছিল সুধন্য আর নীপা। তিস্তা চটপট সেই অটোতেই উঠছে দেখে নীপা ভ্রূভঙ্গি করে বললে, ‘এদিকে আসবে? সরে বসব?’

‘না না, তার দরকার নেই’–তিস্তা অটোতেই উঠে বসে ঠোঁট ফাঁক করল, ‘তবে দূরে থাকতে ভরসা হল না, কাছাকাছিই রইলাম ওই জন্যে।’

অন্য অটোও ততক্ষণে বাকিদের নিয়ে ভর্তি, কিন্তু দীপার ভুরু তখনও সোজা হয়নি। পরিস্থিতি একটু সহজ করার জন্যে বিনত বললে, ‘ও রাধুকাকা, আপনার ধারাভাষ্য কী হল?’

‘হবে হবে’–রাধুকাকা ভুরু নাচিয়ে বললেন, ‘ইঞ্জিন স্টার্ট না হলে আমি স্টার্ট করি কেমন করে।’

‘একটু চটপট শুরু করুন কাকু’–বোসদা বললেন, ‘এক্ষুনি ধারাপাত শুরু হলেই ধারাভাষ্য চৌপাট।’

‘ঠিক বলেছেন।’ রাধুকাকা সোজা হয়ে বসলেন, কণ্ঠস্বর যথারীতি উচ্চগ্রামে তুলে শুরু করলেন–‘আমার চোখের সামনে এখন সদ্যোস্নাতা পৃথিবী। দুটি গাড়িতে কিছু উচ্ছল যুবক-যুবতী, কিশোর-বালিকা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। না, প্রৌঢ়ার অবশ্য অভাব আছে এখানে, সে অভাব পূর্ণ করেছে একটি প্রৌঢ়–কারণ সে একাই একশো।’

অন্য গাড়ি থেকেই হাসির রোলটা বেশি শোনা গেল। গাড়ি সচল হল।

এমন কিছু বেশি রাস্তা নয়, বিনত দূর থেকে তপোবন পাহাড় দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। স্লেটরঙ পাথরের বিরাট চাঁইগুলোকে কে যেন দূর থেকে স্রেফ ছুঁড়ে দিয়েছে। এই অনায়াস সজ্জা এবং এলোমেলো ক্রমই ওর ভালো লাগছিল। এর ইতিহাস ও জানে না, কিন্তু হাওয়ায় অদৃশ্য তুলির টানে মনে মনে ও গোটা ছবিটাই এঁকে ফেলছিল।

BANGLADARSHAN.COM

অটো থামতেই ছেঁকে ধরল কিছু অল্পবয়সী ছেলে। ছোলা কিনতে হবে হনুমানকে খাওয়াবার জন্যে–নইলে ওরা উৎপাত করবে, উঠতে দেবে না। রাধুকাকা চটে উঠে কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কুট্টুস আর তপার উচ্ছ্বাসে সেটা মিলিয়ে গেল। প্রত্যেকেই কিনে নিল এক প্যাকেট করে, কুট্টুস আর তপা আবার আর একটা করে বাড়তি।

বেশি উঠতে হল না, দু-চারটে সিঁড়ি ডিঙোতেই হনুমানের দল ভিড় করে এল।

কুট্টুস ছিল বিনতর কাছে, ভয় পেয়ে সে আঁকড়ে ধরেছিল বিনতকে। একটা ছোলার ঠোঙা হনুমানটার কাছে এগিয়ে দিতেই সে এমন কৌশলে সেটা ছিনিয়ে নিল যে ভয় ভুলে কুট্টুস হেঁচকি তোলার মতো করে হেসে উঠল, বলল, ‘এক্কেবারে হনুমান, তাই না জেঠু!’

‘যা বলেছিস।’

একটু বেশি খাড়া সিঁড়ি, অবশ্য পাহাড়ের সিঁড়ি ওইরকমই হয়। উৎসাহের আধিক্যে কুট্টুসকে নিয়ে বেশ দু-চার ধাপ এগিয়েই এসেছিল বিনত, পেছন ফিরে দেখল গোটা দলটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কী যেন একটা শলা-পরামর্শ চলছে সকলের।

কী হতে পারে ব্যাপারটা। ভেতরে ভেতরে বেশ কৌতুক বোধ করছিল বিনত। কুট্টুস বলল, 'কী হল জেঠু, চল!'

'দাঁড়া না!' জোর গলায় পরিহাসের ভঙ্গিতে বললে বিনত, 'দেখছিস না, হনুমানের ভয়ে কেউ আসতেই চাইছে না ওপরে!'

'মোটেও না মশাই'—নীপা গালে টোল ফেলে হাসল, তারপর তরতর করে কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি এখানেই একটু রেস্ট নিন।'

'কেন, ভীতু বললাম বলে?' বিনত হাসিমুখে কুট্টুসের দিকে চাইল, 'দেখেছিস তো! একটু খ্যাপালাম বলে কীরকম শোধ তুলছে আমাদের ওপর!'

'আহা, ছেলেমানুষি করো না'—দীপা নড়বড় করতে করতে উঠে এল, 'কী হবে ওপরে উঠে, শুনি! চারটে হাত গজাবে?'

'হ্যাঁ বাবা, তুমি বসো না এখানে'—তপা সমর্পন করল মাকে, 'আমরা এক্ষুনি ঘুরে আসছি ওপর থেকে।'

BANGLADARSHAN.COM

এতক্ষণে বিনতর যেন একটু একটু মনে হচ্ছিল, ওরা রসিকতা করছে না। খুশির ভাবটা মুখ থেকে সরে যাচ্ছিল বোধহয় দ্রুত, বোসদা বুঝতে পারলেন। কাছে এসে বললেন, 'ভেরি সরি মিস্টার সেনগুপ্ত, তিন বছর আগে অ্যাটাকটা হয়েছিল? না না, তাহলে আর রিস্ক নেবেন না, প্লিজ!'

সুধন্যর দিকে চাইল বিনত। ওর অসুখের সমস্ত ব্যাপারটাই সুধন্য খুব ভালো করে জানে, ঘটনাটা অফিসেই হয়েছিল। সুধন্য কিছু বলছিল না, কিন্তু একটা অদৃশ্য নিষেধ যেন স্থির হয়েছিল তার মুখের রেখায়, নীরব অভিব্যক্তিতে। তিস্তার মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, নাকি ইচ্ছে করেই অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখেছে, কে জানে!

মুখের রেখা শক্ত হচ্ছিল বিনতর, দীপার দিকে চেয়ে বলল, 'কী আশ্চর্য, তোমরা এমন করে বলছ কেন আমাকে? আমার শরীর আমি বুঝি না। কষ্ট হলে আমি উঠব!'

'কী দরকারটা কী তোমার—তুমি কি ট্রেকিং করছ নাকি! পাহাড়ে না উঠলে চলছে না তোমার!'

সেটা তো তোমাদের সম্বন্ধেও বলা চলে। কথাটা মুখে প্রায় এসে গিয়েছিল বিনতর, কিন্তু সেটা উচ্চারণ করার আগেই একটা তীব্র কর্কশ ধারালো গলা আছড়ে পড়ল ওর ওপর—'নো, নেভার! তুমি যাবে না ওপরে—কক্ষনো না। ডোন্ট টেক এনি রিস্ক। আনন্দটা মাটি করবে নাকি আমাদের!'

মুখ তুলে চাইতে পর্যন্ত এখন ঘেন্না করছিল বিনতর। কুট্টুসের মুখটা চোখে পড়ল, বেদনার স্পষ্ট ছাপ তার মুখে, বলল–'ঠিক আছে জেঠু, আমিও ওদের সঙ্গে যাব না ওপরে। তুমি আর আমি এখানেই বসে বসে দেখব, কেমন!'

'ওমা, সে কী রে'–তিস্তা কী যেন একটা ইঙ্গিত করার চেষ্টা করল ওকে।

'দূর বোকা, আয় আয়!' তপা এসে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওকে হাত ধরে।

মুখের ভেতর একটা কটু স্বাদ টের পাচ্ছিল বিনত। লালার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, ঢোক গিলতে গেলেই স্বাদটা পাওয়া যাচ্ছে। ওর চোয়াল নীচে নেমে আসছিল, হাতের মুঠো দৃঢ়বদ্ধ হচ্ছিল। ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা ক্রোধ উঠে আসছে এখন মেরুদণ্ড বেয়ে, ও বুঝতে পারছিল। কানের লতি গরম হয়ে উঠছিল, দু'পাশের রগ দপদপ করছিল। চোখ তুলে তাকাল বিনত।

গোটা পরিবেশটাই যেন পালটে গেছে এখন। সামনে পাথুরে ভূমি, দূরে অচেনা প্রান্তর। হাওয়ায় ঝাঁঝালো গন্ধ। সার বেঁধে ওপরে উঠছে কিছু প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী–যাদের মন নেই বোধ নেই অনুভূতি নেই, আছে শুধু কয়েকটি জৈবিক শরীর।

'এই দ্যাখ, আমি উঠেছি নীপা–পারব না বলছিলি না!' চোখের দৃষ্টি এখন স্বচ্ছ ছিল না বিনতর, একটা আদিম নারীকেই যেন দেখতে পাচ্ছিল। মুখে বিজয়ের নগ্ন হাসি। ধপধপে সাদা মুখে হিংস্র দাঁতগুলো ঝকঝক করছে।

BANGLADARSHAN.COM

'কী মিস্টার, এক মেয়ের মা হয়েও পারি কিনা দেখো'–শালোয়ার-কামিজের ওপর আগাগোড়া আঁকা একটি মুখ, লাল দগদগে দুটো ঠোঁট। বিষাক্ত ক্ষতটা যেন মুখময় ছড়িয়ে যাচ্ছে।

'আমাকে দেখ, আমাকে–দা ম্যান অ্যাট দি টপ!' নরখাদক অসভ্য মানুষের মতো একটা মূর্তি, তার কণ্ঠ পাহাড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। অতি কষ্টে মাথা অনেকটা ওপরে তুলল বিনত। লম্বাটে পেন্টাগনের মতো একটা করোটি বীভৎস মুখব্যাদান করে আছে–না-মাংস না-মজ্জা না-রক্ত না-কিচ্ছু। কেবল করোটির মধ্যে হাড়ের ঠোকাঠুকি।

তাকাতে পারছিল না বিনত। অসহ্য যন্ত্রণা, ক্রোধ আর অসহায়তার মধ্য দিয়ে ওর মনে পড়ে যাচ্ছিল তিন বছর আগেকার সেই দিনটার কথা।

ডাক্তার বলেছিলেন, 'আপনি ভুলে যান আপনার এ অসুখ হয়েছিল। দিস ইজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট, সকলেরই হতে পারে।'

'কিন্তু এই ওষুধ! আপনি যে বলছেন অনেকদিন চলবে?'

‘সারা জীবনই চলুক না, ক্ষতি কী! কত লোককেই তো কত রকমের ওষুধ খেয়ে যেতে হয়, সো হোয়াট!’ ডাক্তার চেয়েছিলেন দীপার দিকে, তপার দিকে। সুধন্যও ছিল তখন কাছে। ডাক্তার বলেছিলেন, ‘আপনাদের সকলেরই দায়িত্ব কিন্তু এটা, মানে অসুখের কথা ভুলতে ওঁকে সাহায্য করাটা।’

‘নিশ্চয়ই!’ দীপা বলেছিল, ‘কিচ্ছু ভাববেন না আপনি। অবশ্যি তার দরকার হবে না—উনি নিজেই কথাটা মনে রাখতে পারবেন না। যা কাজপাগলা মানুষ!’

‘হ্যাঁ, সেই তো!’ সুধন্য হেসে বলেছিল, ‘তবে আমাদের যা করবার আমরা করে যাব।’

‘ঠিক বলেছ’—তিস্তা বলেছিল, ‘হরদম গিয়ে জ্বালাতন করব আমরা ওঁর বাড়িতে, মনে রাখার চান্স দিলে তো ওঁকে!’

‘থ্যাঙ্কিউ ভেরি মাচ!’ ডাক্তার স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়েছিলেন বিনতর দিকে—‘নিয়মগুলো মানবেন—ওষুধটা খাবেন ঠিকমতো, কিন্তু কিচ্ছু ভাববেন না এ নিয়ে।’

‘কাজটাই করা যাবে তো আগের মতো?’ বিনত জানতে চেয়েছিল।

‘স্বচ্ছন্দে। যত খুশি কাজ করুন—মানে যতটা আপনার শরীর অ্যালাউ করে, কিচ্ছু ক্ষতি হবে না। শুধু আপনাকে অসুখের কথাটা ভুলতে হবে, ইয়েস ইউ মাস্ট।’

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু কী করে! কী করে!

ভেতর থেকে একটা অসহায় আক্রোশ ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছিল বিনতকে। যন্ত্রণাটা আরও বেড়ে যাচ্ছিল যখন সামনে কিছু নখদাঁতওয়ালা প্রাণীকে উল্লসিত লাফালাফি করতে দেখছিল।

দাঁতের চাপে নীচের ঠোঁট কেটে যাচ্ছিল বিনতর। ভুলতে হবে, ভুলতে হবে—শব্দ দুটো ঝমঝম করে বাজছিল কানের ভেতর, বাদুড়ের মতো উড়ে বেড়াচ্ছিল চারপাশে। আর তারই মধ্যে অকস্মাৎ আর একটা বিশীর্ণ যন্ত্রণা একেবারে ছড়িয়ে পড়ল বিনতর বুকের মধ্যে।

মনে পড়েছে। মনে পড়েছে।

সকাল থেকে যে অস্বস্তি ওকে কুরে কুরে খেয়েছে, যে কথাটা মনে করার জন্যে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে—কী একটা করা হয়নি ভেবে সারা দিন ছটফট করেছে ভেতরে ভেতরে—

আশ্চর্য! এত বড় কথাটা ওর মনে পড়েনি এতক্ষণ!

ছি!

দু'হাতে মাথার লম্বা চুল টেনে ধরেছে বিনত। রাগে, যন্ত্রণায় ফুলে উঠেছে মাথার শিরা। অব্যক্ত যন্ত্রণায় একটা চাপা আর্তনাদ এসেছে ওর কণ্ঠ চিরে।

এগারোই অক্টোবর। আজ মায়ের মৃত্যুদিন।

ভুলে গিয়েছিল দিনটাকে। কী করে তা সম্ভব!

ভেতরে ভেতরে একটা অসহ্য জ্বালা অনুভব করছিল বিনত। স্থির হয়ে বসতে পারছিল না ও এক জায়গায়।

দশ-দশটা বছর হয়ে গেছে, কিন্তু এমন ভুল তো কখনো হয়নি, কক্ষনো না। এবারই প্রথম কেমন অবিশ্বাস্যভাবে–

নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিল না বিনত। এই দুঃসহ ব্যাপারটা যেদিন ঘটে, মনে হয়েছিল এখন জীবনটাই অর্থহীন, এই কাজকর্ম ঘর-সংসার–দীপা তপা সব কিছু। এগারো তারিখটাকে ভুলতে পারত না একেবারেই। প্রথম বছরটা প্রত্যেক মাসের এগারো তারিখ অফিস থেকে ফিরে আসত সকাল সকাল। ধূপটুপ জ্বেলে বসে থাকত মায়ের ছবির সামনে। তপাও বসত এসে পাশে, মায়ের গল্প বলত বিনত মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে।

কেমন করে ব্যাপারটা পিছিয়ে গেল–মাসের বদলে বছরের ব্যবধান এল কেমন করে! আর তারপর আজকের এই অবিশ্বাস্য অকৃতজ্ঞ ব্যাপারটা!

BANGLADARSHAN.COM

মাথার ভেতর হাতুড়ির ঘা মারছিল কেউ। একটা অস্থির যন্ত্রণায় ও উঠে দাঁড়াল। দুটো বিপরীতমুখী স্রোত বয়ে যাচ্ছিল এখন ওর মাথার মধ্য দিয়ে। মনে হচ্ছিল, কথাটা কাউকে বলতে না পারলে ও পাগল হয়ে যাবে। ওকে বলতেই হবে কাউকে, এই মুহূর্তে।

একটা কথা ও মনে রাখতে চেয়েছে আজীবন, তিল তিল করে তাকে লালন করতে চেয়েছে। অথচ কখন যে কথাটা খসে পড়ে গেছে ওর চলমান জীবন থেকে, বুঝতেই পারেনি ও। যে কথাটা ভুলতে চেয়েছে, সকলে ভুলতে বলেছে–সেই কথাটাই বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা জায়গা খুঁজে নিয়েছে। হাজার চেষ্টা করলেও সে কথাটা এখন আর–

খেয়াল ছিল না কখন একটু একটু করে এগিয়ে এসেছে, কখন পাগলের মতো এলোমেলো পায়ে পাথর ডিঙোতে শুরু করেছে। কেমন যেন মনে হচ্ছিল ওর, এগোতেই হবে, এগিয়ে যেতেই হবে, থেমে গেলে চলবে না। এক জায়গায় আটকে থাকাটা বড় কষ্টের, বড় যন্ত্রণার।

ওপর থেকে কি কেউ চিৎকার করছে! কেউ কি কিছু বলছে ওকে! ওর কোন আপনজন!

বেসামাল পা হড়কে গিয়েছিল সদ্য বৃষ্টি-হওয়া পাথরের পিচ্ছিল সিঁড়ি থেকে। টাল খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে ধরে ফেলেছে পাশের একটা আশ্রয়। এবং সেই মুহূর্তে–

ঠিক সেই মুহূর্তে যেন অন্য কোন জগৎ থেকে ভেসে আসছিল মায়ের এই সময়কার অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর!

বুকের ভেতরটা তখনও ধক ধক করছিল বিনতর। আর একটু নীচে চোখ গেল। না, ও ভুল শুনেছে।

অলৌকিক কোনো একটা স্বপ্নের মতো দেখতে পাচ্ছিল, দুটো দেহাতি বাচ্চা পাথরে পাথরে ঠুকে খেলা করছে। আওয়াজটা সেখান থেকেই উঠছে। ঠক ঠক–ঠক ঠক–ঠক ঠক–!

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥